তাবিজ

খন্দকার মোঃ আবদুল গণি

কলেজ থেকে নলকুপের হাতলটা ধরে সবেমাত্র হাত-পা ধুয়ে উদ্যত হয়েছি ইতিমধ্যে ছোটবোনের মুখে খবর পেলাম বন্ধুমহলে ডাক পড়েছে। দেরী না করে ত্বড়িৎ গতিতে নাকে-মুখে কিছু গুঁজে দিয়েই গন্তব্যস্থলের দিকে যাত্রা করলাম। থাকি পাড়াগাঁয়ে। কোথাও যে বসে মনের ভাব প্রকাশ করব তা স্বভাবতঃ হয়ে উঠে না। পাড়ার মুরব্বীরা একসঙ্গে কয়েকজন উঠতি বয়সের তরুণকে খোশগল্পে মেতে উঠতে দেখলে আর নিস্তার নেয়। খোঁজ খোঁজ রব পড়ে যায় যেন পাড়াসুদ্ধ সকলের চোখের বিষ। অপরের গাছের দু'চারটি আম-জাম আর নারিকেল না হয় আমাদের পাকস্থলীতে পড়ে কিন্তু তাই বলে এমন চোখে চোখে রাখা। অফুরন্ত ভান্ডারের মধ্যে একটু খোয়া গেলে কি ই বা এমন ক্ষতি! সে যাই হোক – এমনি যখন অবস্থা তখন একত্রে জড়ো হবার মত একটি জায়গা খুঁজে নিয়েছি গ্রামের বেশ খানিকটা বাইরে গোরস্থান আর শ্বসানের মাঝামাঝি জায়গায় আদিকালের পুরনো এক বট বৃক্ষতলে। এ স্থানে নেহাৎ প্রয়োজন না হলে কেউ পদধূলি দেয়না বলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবের আদান – প্রদান করতে পারি। অবশ্য দু' একজনের ক্যাপসুল (তোমাকে পাতার বিড়ি) খাবার অভ্যেস যে নেই তা নয়। এ কর্মে কেউ নবীন আর কেউ প্রবীন। আমি অবশ্য নবীনদের দলে, এখনো হাত পেকে উঠেনি। যথাস্থানে পৌঁছে দেখি শান্ত , কালু , সাজু , রবি, শাহিদ এবং আরও প্রতিবেশী গ্রামের বেশ কয়েকজন আমাদের সমবয়সী তরুণ একনিষ্ট মনে কি যেন ভাবছে। আমার পদধ্বনী শোনামাত্র তাদের সকলের দৃষ্টি একে একে নিবন্ধিত হল আমার দিকে। তাদের বিস্তার কারণ জিজ্ঞাসা করা মাত্র শান্ত ততোধিক চিন্তিত মুখে বলল যে তারা সকলে একটি সিরিয়াস বিষয় নিয়ে ভাবছে। সিরিয়াস বিষয় কি তা জানার নিমিত্তে আগ্রহ করলে যা জানতে পারলাম তার মমার্থ এই যে আমাদের সকলের মধ্যমনি বন্ধুবর শহীদ প্রচন্ড দুঃচিন্তায় কাল কাটাচ্ছে এ জন্য যে সরকার বাড়ীর ছোট কন্যা তানিয়া তার মন হরণ করেছে কিন্তু মান্যবর বন্ধু এখন ও পর্যন্ত কন্যাটির মনের ফটক খোলার কোন পথ আবিষ্কার করতে পারেনি। বন্ধুর বিপদে আমরা চুপ করে বসে থাকব এমন স্বার্থপর মোটেই আমি নই! তাই সকলে একত্রিতভাবে বিভিন্ন পথ বের করতে লাগলাম কিন্তু কেউ মেয়েটির সাথে কথা বলতে রাজী হলোনা। শেষে সিদ্ধান্ত হলো চিটি লিখে মেয়েটিকে দিতে হবে। কিন্তু কে দেবে? চিঠি না হয় লেখা গেল কিন্তু পৌঁছাবে কে? শেষকালে পত্রলেখক এবং বাহক দুই.....ই....আমাকে হতে হলো অবশ্য সাহায্য করার জন্য শান্ত আমার সাথে যেতে চাইলো। পত্র লিখলাম কিন্তু পৌঁছাব কি করে? কেউ দেখে ফেললে আর নিস্তার নেই। তাছাড়া ভয় ও হতে লাগল মেয়েটি যদি সব বলে দেয়? পত্র না দিয়ে ও উপায় নেই, হাজার হোক বন্ধু তো, এমন ক্রান্তিকালেই তো বন্ধুর পরিচয়। শেষ অবধি সিদ্ধান্ত নিলাম সন্ধ্যায় মেয়েটি যখন তার পড়ার টেবিলে থাকে তখন একেবারে উত্তরের দিকে যে আমবাগান আছে, সে পাশের জানালাটা খোলা থাকে। সেই জানালা দিয়ে পত্রটা ছুঁড়ে মারলে হয় তার মাথায় লাগবে নতুবা মাথার ওপর দিয়ে গেলে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে পড়ার টেবিলে পড়বে। এর চাইতে ভাল কোন পথ আর নেই তাই

একদিন সন্ধ্যাকালীন সময়ে সুযোগ বুঝে দু'বন্ধু একত্রিত ভাবে আমবাগানের ও দিকটায় পৌঁছলাম। সময়টা বোধকরি জৈষ্ঠ্যের শেষের দিকে। বেশ কিছু গাছে আম পেঁকেছে আর কিছু গাছে পাকি–পাকি পর্যায়ে। চুরি হবার সম্ভাবনা যেহেতু ক্ষীণ সেহেতু বাগানে কোন পাহারাদার নেই। ভাবলাম রথ দেখা আর কলা বেচার মত এককাজে দুই কাজ করব। শান্তকে আম চুরির দায়িত্ব দিয়ে প্রধান কাজের উদ্দেশ্যে আমি গুটি গুটি পায়ে জানালার দিকে এগুচ্ছি এমনি সময়ে কার যেন পদধ্বনী শুনে ভয়ে ভীত হয়ে চিঠিটাকে পার্শ্ববতী ডোবায় ফেলে দিয়ে " শান্ত আয় " বলে দিলাম কষে এক দৌড়। শান্ত ও আমাকে অনুসরণ করে পিছু পিছু দৌড়াতে লাগল। বাগানটা ক্ষুদ্র নয় প্রায় ১০/১৫ বিঘার মত। পথভ্রষ্ট হয়ে আমরা দু'জন বাগানের শেষ মাথায় যে পুকুর আছে তার পাশে এসে উপস্থিত হলাম। এখন ফিরব কি করে? পেছনে মানুষ আর সামনে পুকুর যার পার ভর্তি খেজুর কাঁটায়। পুকুরের ও প্রান্তে পৌঁছলে বড় রাস্তা আর এই সন্ধ্যাকালীন সময়ে পথিকদের পথ চলাই স্বাভাবিক। যদি ধরা পড়ি তবে আর রক্ষা নেই। অনেক কষ্টে ঘর থেকে বের হয়েছি্ একদিকে ঘরের পিটুনি আর অন্যদিকে বাইরের শেষে বিপদকালীন সময়ে যা করে তাই করতে লাগলাম। আল্লাহ্ কে এমনভাবে ডাকতে লাগলাম যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি যে আল্লাহ্ কে তাঁর আসন হতে নামাবোই। শেষ অবধি ভাবতে লাগলাম আল্লাহ্কে ডেকে বিশেষ কোন ফল হবে না। যে কাজ করতে এসেছি তাতে ধরা পড়লেই বরঞ্চ তিনি খুশী হবেন এ জন্য যে তাতে অন্ততঃ দু'টি চোরের সাজা হবে। কিন্তু বাঁচতে তো হবেই তাই পুকুর ধার বেয়ে কর্দমাক্ত পায়ে জুতো দু'পাটি হাতে নিয়ে বড় রাস্তায় এসে উঠলাম। বড় রাস্তায় উঠে বাঁচার পরিবর্তে কপালে নতুন বিপত্তি এসে জুটল। দু'তিনজন মধ্যবয়স্ক লোক আমাদের ধরে ফেলল। বাঁচার জন্য তাদের বললাম খালেকের সাথে বাজী ধরেছি যে এই রাত্রি কালে ওকে আমবাগান থেকে আমচুরি করে খাওয়ার। একজন কথাগুলো হালকাভাবে নিলেন কিন্তু বাকী দু'জন বেজায় বেখাট্টা। কিছুতেই ছাড়তে চায় না। শেষকালে প্রমান করার জন্য খালেকের বাড়ীর দিকে নিয়ে গেল। বলা বাহুল্য খালেকের সাথে এ ব্যাপারে আমাদের কোন কথাই হয়নি। বন্ধুত্বের বিশ্বাস আর যেহেতু সহপাটী সেহেতু সে বাঁচাবে এ আমাদের বিশ্বাস। অবশ্য বিশ্বাসের অমর্যাদা সে করেনি। সে যাই হোক.....। খালেকের বাড়ীতে গিয়ে দেখলাম এই সন্ধ্যাকালীন সময়েই সে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম থেকে ডেকে তুলে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বলে উঠলাম– তোর সাথে বাজী লেগে আম চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছি। ইতিপূবে খালেকসহ আমরা বেশ কয়েকবার এমন অপকর্ম করেছি। তাই সে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে শেষ অবধি চোরে চোরে মাস্তুত ভাই হয়ে আমাদের বেরসিক অপরের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য বলে উঠল– আমি ঠাট্টা করে বললাম আর তোরা তাই করলি? ঘটনার সত্যতা পেয়ে আমাদের দু'জনকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। সমূহ বিপদের সম্ভাবনা যখন একেবারেই নেই তখন তিনজন একত্রে ক্ষণকাল স্বস্তির হাঁসি হাঁসলাম। তারপর খালেক আমাকে জিজ্ঞাসা করল– কি হয়েছে, বলতো সোহেল? সমস্ত কিছু সবিস্তারে শুনে খালেকের হাঁসি যেন আর থামতে চায় না শেষ অবধি যখন থামল তখন শুরু হল কথোপকথন। কথোপকথন শেষ হতে রাত্রি বেশ হয়ে গেল। তাই ঘরে ফিরতে উদ্যত হলাম। পথের মধ্যে

শান্ত বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগল পত্রটি দিতে পেরেছি কি না। আমি তাকে আশ্বস্ত করে বললাম এতক্ষনে পেয়ে গেছে এবং পড়েছে, উত্তরটা দিল বুঝি। আমার কথা শুনে খুশীতে শান্তর চোখ–মুখ উজ্জল হয়ে উঠল। অত্যন্ত বিস্ময় ভাব প্রকাশ করে বলল– উত্তর কি দেবে? – দেবে না মানে? হ্যাঁ না একটা কিছুতো বলবেই। এমনিভাবে শান্তকে আশ্বস্ত করে ফিরে এলাম এবং সমস্ত ঘটনাটি কল্পনা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরেরদিন বিকেলে পূর্ব দিন মত আবার ও সকলে একত্রিত হলাম। সমস্ত ঘটনা শুনে সকলে আমাকে সাবাস দিতে লাগল। প্রশংসায় আমি তখন বিগলিত। শহীদ তো যার–পর নাই খুশী। খুশীতে আমাকে জড়িয়ে ধরে পরের দিন কলেজে যাবার এবং সমস্ত নাস্তাপানির ভার নিজ হাতে তুলে নিল। ইতিপূর্বে বহুবারই অবশ্য সে তা করেছে। শুধু আমার জন্য নয়, বন্ধুমহলে সে দাতা হাতেম–তাঈ। মা আর ছেলের দু'জনার সংসারে তেমন কিছু ব্যায় হতো না। সংসারের কর্তা হিসাবে সমস্ত কর্তৃত্বের ভার নিজ হাতে ন্যাস্ত ছিল বলে অকাতরে বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হতো না এবং পারতও। তানিয়ার পক্ষ থেকে কোন উত্তর এলো না। আসবে কি করে? সেতো আর জানে না যে একটি ছেলে তাকে ভালোবাসে পত্র পাবার প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হয়ে আছে। আমরা যেটা পাঠিয়েছি সেটাতো ডোবায় পড়েছে। ডোবায় যদি বোধোদয় থাকত তবে কোন না কোন উত্তর দিত। যেহেতু নেই সেহেতু আমার পৌঁছানে প্রেমবাণী ভরা লিপিকা সে হজম করে দিয়েছে। এমনি করে পক্ষকাল অতিক্রান্ত হবার পর যখন আর কোন উত্তর এলোনা তখন সকলেই উত্তেজিত হয়ে প্রতিশোধ নিতে চাইল। আমি সব কিছু শুনে মুখ টিপে হাসতে লাগলাম এ জন্য যে এদের বৃথা আস্ফালনের সাথে আমি পূর্ব পরিচিত। সর্বোপরি নিজেদের মধ্যে একটু কড়া কথার আদান–প্রদানই সার যুদ্ধক্ষেত্রে এরা প্রচন্ড ভীরু এবং কাপুরুষ। ইতিপূর্বে অনেক প্রমান পেয়েছি। এইত সেদিন চোর ধরতে গিয়ে শান্ত ও কালু যখন নিজেরাই চোর হয়ে ফিরে এল তখন পাড়াসুদ্ধ সকলের সে কি হাঁসি! ভাগ্যিস সকলের পরিচিত! অন্য গ্রামে হলে কি যে হত! উত্তর এলো না আবার আমরাও কিছু করতে পারলাম না। দিনে দিনে শহীদের মাঝে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। আগের মত হাঁসি–খুশী রূপ আর চোখে পড়ল না। দিনে দিনে আমাদের মাঝে ব্যাপক দুরত্ব সৃষ্টি হতে লাগল। এতে আমাদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হতে লাগল বিশেষ করে আমার কারণ কলেজের নাস্তা থেকে শুরু করে যাবতীয় খরচ শহীদের পকেট হতে যেত, ওর অনুপস্থিতে আমার পকেটের কড়ির বিনাস ঘটতে লাগল। এমনি চলতে থাকলে ছোট বোনের মাটির ব্যাংক চুরি করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না আর চুরি করলে কপালে উত্তম –মধ্যম কিরূপ পড়বে তা ভেবে ও শিহরিয়া উঠলাম। এখন কি করা যায়? অবলম্বনকে ধরতে হলে ওর মনের মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে দিতে হবে যা অন্ততঃ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দিন গড়িয়ে জৈষ্ঠ্য–আষাড়–শ্রাবণ অতিক্রান্ত হতে চলল কিন্তু কোন সুরাহা করতে পারলাম না। একদিন রাত্রি ৯/১০ টার দিকে কতিপয় বন্ধু মিলে পশ্চিম পাড়ার পুরানো কালভার্টটায় এসে বসলাম। খোশ–গল্প অনেক্ষণ ধরে চলল। শেষে লক্ষ্য করলাম রাস্তায় কার যেন গানের কলি ভেসে ভেসে আসছে। তৎক্ষণাত মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি এসে উপস্থিত হল। ভাবলাম পথিককে ভয় দেখিয়ে একটু মজা করা যাক্। যা ভাবা তাই কাজ। আমাদের মধ্যে

শান্ত ছিল সবচেয়ে বেশি লম্বা প্রায় ছ ফুট। ওর গায়ে ছিল ঢিলে ঢালা সাদা শার্ট। আমার গায়ের সাদা গেঞ্জিটা খুলে মাথায় বেঁধে নিল এবং কালুর পরণের সাদা চেক লুঙ্গি খুলে নিয়ে পরে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল। আমরা কালভার্টটার নীচে গিয়ে লুকোলাম। পথিক সামনে আসামাত্র শান্ত হিঃ...হিঃ... করে হেঁসে উঠল। আমরা সকলে ওর সাথে তাল মিলালাম। আমাদের একত্রিত কণ্ঠ ধ্বণী সত্যি সত্যি এক ভয়াল পরিবেশের সৃষ্টি করল। আমরা নিজেরা ও ভাবতে লাগলাম এ কণ্ঠ আমাদের কি না। পথিক নিকটে এসে শান্তর ভয়ার্ত মূর্তি দেখে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে রাস্তার ওপর মুর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। ইতিমধ্যে আমরা আমাদের পোশাক পরিবর্তন করে পথিকটির মাথায় পানি ঢেলে সস্থি করে দেখি আমাদের পাড়ার মজা মিয়া। মজা মিয়া ধীরে ধীরে চোখ তুলে আমাদের দিকে চাইল। তারপর ভয়ার্ত ভাব কাটিয়ে বলে উঠল– ভাগ্যিস্ খাজা বাবার তাবিজ ছিল! আমরা তখন স্ব–উৎসাহে জানতে চাইলাম ঘটে যাওয়া ঘটনার বিবরণ। তখন সে আদ্যপ্রান্ত বর্ণনা করল। আমরা তখন মুখ টিপে টিপে হাঁসতে লাগলাম। সেদিকে মজা মিয়ার কোন দৃষ্টি নেই। তাবিজ দু'টোকে বারবার চুমো খেয়ে পুনরায় বলে উঠল– পালাইলি কেন, ভূতের বাচ্চা–ভূত? আয় সামনে আয়..... আমি তখন খুব উৎসাহ নিয়ে মুখটাকে গম্ভীর করে মজা মিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলাম– পালাবে না– এ কি যে সে তাবিজ! মজা মিয়া তখন খুব উৎসাহ নিয়ে বলতে লাগল যে তার ওস্তাদ কামাখ্যায় গিয়ে সিদ্ধি লাভ করেছেন। এমন কোন কাজ নেই যে করতে পারে না। প্রতিদিন দু' চারজন লোক তাঁর কাছে এসে তাবিজ নিয়ে যায়। মজা মিয়ার কথা শুনে তৎক্ষণাত প্রস্তাব দিয়ে বসলাম– মজা ভাই আমর একটা কাজ করে দেবে? একটা কিরে তোর জন্য দশটা কাজ করতে পারি। বল, কি কাজ? আমার এক বন্ধু একটি মেয়েকে ভালোবাসে কিন্তু মেয়েটি বাসেনা। একটা তাবিজ দেবে? আমার কথা শুনে ক্ষণকাল স্তব্দ হয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল– দেখি ওস্তাদকে বলে, পারে কি না। এই না বললে, সব কাজ পারে। তা পারে তবে রাশির একটা ব্যাপার আছে না? রাশি মিললে হবে নয়তো না। রাশি মেলানো যায় না? আমি ঠিক বলতে পারি না। ঠিক আছে, কাল তুই আমার সাথে আয়। হবে না মানে? দেখলি না ভূতটা ক্যামন বাপ বাপ করে পালিয়ে গেল। ভূত তো আমরাই ছিলাম তথাপি মজা মিয়ার কথা আমার বিশ্বাস হল। কিন্তু আমার বন্ধু শান্ত যে প্রকৃত ভূত সেই বাধ সাধল। সে বলে উঠল– আরে ব্যাটা ডাহা মিছা কথা। তাবিজ দিয়ে মন জয় করা গেলে সবাই করত। শান্তর কথা শুনে মজা মিয়া কিছুটা উত্তেজিত হয়ে উঠল। মুখে একপ্রকার বিরক্তি ভাব প্রকাশ করে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল– না হলে সবাই করে কেন? আর ঝগড়া করতে মন সায় দিল না। একটা প্রমান করেই দেখা যাক্ না হলে হলো না হলে অন্যপথ। তাই কোন প্রকার ঝগড়া না করে সবাই যার যার ঘরে ফিরে এলাম। পরের দিন অপরাহ্নকালে ফুফুর বাড়ীতে যাবার নাম করে ঘর হতে বের হলাম। পথিমধ্যে শহিদ এর সাথে স্বাক্ষাত ঘটল। গতরাতের সমস্ত ঘটনাই সে শুনেছে। তাই অনেকটা উৎফুল্ল হয়ে নুতন আশা বুকে ধারণ করে আমাদের সাথে যেতে চাইল। তিনজন মিলে সন্ধ্যা নাগাদ মজা মিয়ার ওস্তাদের বাড়ীতে পৌঁছলাম। ওস্তাদ বটে! কালো ভুরুর ওপর দৈত্যের মত খোঁচা খোঁচা লোম। চোখ তো নয় যেন কোটরের ভেতর

সাজানো দু'টি মার্বেল। চোখে দয়া–মায়ার কোন চিহ্ন নেই। মিনিটে মিনিটে পান খায় আর কথা বলার সময় তো ছিট্‌কে ছিট্‌কে শ্রোতার মুখে পড়ে। দু'ঠোটের মাঝে লিপিষ্টিকের মত লাল্‌চে পানের দাগ পড়েছে। দাঁতের শিরার মাঝে মাঝে কাল্‌চে দাগগুলো যেন রাত্রিকালে দেখা নালা। কালো বেঁটে শরীর আর কালো মুখের মাঝখানে লালচে দাগ একটি বিশেষ আকৃতি দান করেছে। দেখলেই ছোট ছোট ছেলে–মেয়েরা দৈত্য ভেবে ভয় পেতে পারে। প্রস্তাবটা পড়তেই ক্ষণকাল চুপ করে রইল। তারপর অত্যন্ত চিন্তিত মুখে বলে উঠল– বড় শক্ত কাজ। – হোক শক্ত কাজ করতেই হবে। আমার জোরালো সমর্থন পেয়ে ওস্তাদ মুখে কৃত্রিম হাঁসি টেনে আনল। তারপর আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল– খরচা পাতির একটা ব্যাপার আছে না? কত লাগবে? জাফ্‌রানি কালি, ট্রেচিং পেপার আর তাবিজের খোল কিনতে হবে। এগুলো বাবদ প্রায় দুইশত টাকা লাগবে। তোমরা আমার শিষ্যের বিশেষ মেহমান তাই আমার পারিশ্রমিক বাদই দিলাম। শহিদ তৎক্ষণাত পকেঠ হতে দুইশত টাকা বের করে দিল। টাকাগুলো পকেটে ভরে ওস্তাদ বারংবার আশ্বস্ত করল যে কাজ অবশ্যই হবে। তারপর মেয়ের নাম, মায়ের নাম নিয়ে সপ্তাহকাল সময় চাইল। আমরা সবকিছু ঠিকমত দিয়ে বাড়ীতে ফিরে এলাম। কাজ হবে এ আনন্দে শহীদ পুণরায় স্বাভাবিক হল। আবার ওর মুখে পূর্ববৎ হাঁসি ফুটে উঠল এবং বন্ধু মহলে নিয়মিত আসা–যাওয়া করতে লাগল। আমরাও ওকে পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। তানিয়া ওর ঘরে পূর্ণ বিকশিত চাঁদের মত জ্বলে অন্ধকার ঘর আলোয় আলোকিত করে তুলবে এমনি স্বপ্নে সে বিভোর এবং সদাই চিন্তার সাগরে হাবু-ডুবো খেতে লাগল। বেশির ভাগ সময় সে অন্য মনস্ক থাকতে লাগল আর আমরা যখন ওকে এ অবস্থা থেকে জাগাতাম তখন সে তানিয়াকে নিয়ে ভবিষ্যতে যে সমস্ত কল্পনা করেছে তা সানন্দ চিত্তে প্রকাশ করত। আমরা কেউ বা মিষ্টি হেসে আবার কেউ বা বাহ্‌বা দিয়ে কল্পনার তারিফ করতে লাগলাম। এমনি করে সপ্তাহকাল শেষ হয়ে গেল এবং ওস্তাদের বাড়ীতে যাবার দিন এসে উপস্থিত হল। কেউ দেখে ফেলবে এই ভয়ে সন্ধ্যার পর যাবার প্রস্তুতি নিলাম। যাবতো কিন্তু কি ভাবে? প্রবল বর্ষণ আর পদ্মার বাঁধ ভাঙার কারণে স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছে এবং সমস্ত রাস্তাঘাট ডুবে গেছে ওস্তাদের বাড়ী যে গ্রামে সে গ্রামের সাথে আমাদের গ্রামের যোগাযোগের যে রাস্তাটি ছিল তার এক জায়গায় ভেঙ্গে গিয়ে প্রায় সাঁতার পানি। সেটা পার হয়ে গেলে কাপড় ভিজে যাবে আর কাপড় ভিজে গেলে পথিমধ্যে অনেকের প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়াই স্বাভাবিক তাই কোন উপায়ান্তর না দেখে নৌকাযোগে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। শান্ত, শহীদ ও আমি তিনজন একত্রে নৌকায় আরোহণ করে ওস্তাদের বাড়ীর দিকে যাত্রা করলাম। উদ্দেশ্য ছিল জোলার মাঝখান দিয়ে নৌকা চালিয়ে যাব কিন্তু শান্ত ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে নৌকা চালাতে বলল এ জন্য যে তাতে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছা যাবে। " অতি লোভে তাঁতী নষ্ট " আমাদের ক্ষেত্রে ও ব্যাতিক্রম ঘটল না। জিরোটি ধানের ক্ষেত (আউশ এবং আমন ধান একত্রে চাষ, প্রথমে আউশ পাকে তারপর আমন) খুব অনায়াসে পার হলাম তারপর শুরু হল আমন ধানের ক্ষেত। এবারের বণ্যায় উহাদের সলিল সমাধি হবার কথা ছিল কিন্তু তা না হয়ে উর্বর পলিমাটি আর বণ্যার জলের আশীর্বাদে এমন ভাবে পরিপুষ্টি সাধন করেছে যে মনে হচ্ছে ধান গাছ গুলো বির্বতিত

হয়ে শাখা–প্রশাখা বিশিষ্ট বৃহৎ উদ্ভিদে পরিণত হয়েছে। এখন আমন ধানের যৌবনকাল। যৌবনের ধর্মমতে কিছুদুর যাবার পরই আমাদের বাধা সৃষ্টি করল। বাধা ঠেলে আমরা আর ও কিছুদুর অগ্রসর হলাম। শেষকালে এমন অবস্থা এসে উপস্থিত হল যেন এটা ধানক্ষেত নয়, রাজপথ যার উপর দিয়া শুধু মাত্র ইঞ্জিন চালিত যানবাহনই চলিতে পারে। এখানে জলের কোন লক্ষণ নেই শুধু ধানগাছ আর ধানগাছ। ক্ষণকাল তিনজন মিলে একত্রিত ভাবে নৌকা ঠেলি আবার ক্ষণকাল বিশ্রাম করি। এমনি করে যখন দুই-তৃতীয়াংশ অতিক্রম করলাম তখন মড়াৎ করে লগি (নৌকার ঠেলার চিকঁন বাশ) ভেঙে গেল। ফলাফল নির্বাসন। আমি বাদে বাকি দু'বন্ধু মহাবিরক্ত প্রকাশ করে ভাগ্যকে গালমন্দ করতে লাগল আমার অবশ্য বেশ ভালোই লাগছিল। মৃদু মন্দ বাতাস, উর্ধ্বে তারা ঝিকিমিকি বিশাল আকাশ, দূরে গ্রামের আবছায়া সমস্ত কিছু এক কাব্যিক পরিবেশ দান করেছে। নিজে কখনো কবি হতে পারলাম না তাই এমন নির্মল পরিবেশ দেখেই নয়নটাকে স্বার্থক করলাম কিন্তু অনুভূতি কোনদিন প্রকাশ করতে পারলাম না। থাক্ সেসব যা হবার নয় তা ভেবে কাজ নেই। ভাবনার ব্যাবচ্ছেদ পড়ল। মস্তিষ্ক চুপ করে গেলে ও কেন জানি প্রকৃতির এই শান্ত সুন্দর প্রতিমূর্তি দেখে মুখটা চুপ করে থাকতে পারল না। মুখ হতে নিঃসৃত হল "এমনি ক্ষণে তুমি আসতে যদি...."। পরের চরণ অবশ্য শেষ করতে পারিনি শান্তর ধমকে। শান্ত ধমক দিয়ে বলে উঠল – এই ব্যাটা চুপ করবি? আমরা মরি জ্বালায় আর উনি কিনা গায় গান। আর একবার গাবি তো মেরে ফেলে দেব। অগত্যা চুপ করতে হল। গালিভারের সাথে লিলিপুটের যুদ্ধ সত্যি সত্যিই হাস্যকর। শক্তির সাথে না পারলেও স্রষ্টার নিজ হাতে সৃষ্টি মস্তিষ্কের শানিত বুদ্ধির কারণে বাল্যকাল থেকেই সবার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে আসছি। এবারও বুদ্ধি বের করার কাজ আমার উপরই ন্যাস্ত হল। কোন কুল কিনারা করতে পারলাম না। শেষে কোন উপায় না দেখে আমার বন্ধুর হবু তনয়াকে অপয়া বলে গালি-গালাজ করতে লাগলাম। অত্যান্ত আশ্চর্য যে গালি দেবার সংগে সংগে শহীদ নৌকা ঠেলার জন্য ঝুপ করে পানিতে নেমে পড়ল। অন্যসময় হলে শহীদকে তিরষ্কার করতাম কিন্তু সে সময় যেন কোথা হতে যেন গভীর মমত্ববোধ এসে উপস্থিত হল। তাই আমরা দু'জনও ঝুপ করে পানিতে নেমে পড়লাম। কাপড় ভেজার সম্ভাবনা ছিল না কারণ প্রধান কাপড়ের নিচে বিশেষ কাপড়ের ব্যবস্থা ছিল। এমনি করে তিনজন একত্রে সাঁতরিয়ে নৌকা ঠেলে যখন ওস্তাদের বাড়ীতে পৌঁছলাম তখন রাত্রি বেশ হয়ে গেছে। ওস্তাদ তখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। অনেক ডাকাডাকির পর দ্বার খুলল এবং মুখে বিরক্তি ভাব প্রকাশ করে বলে উঠল – তোমাদের বাপু অনেক আগে আসা উচিত ছিল। তোমাদের আসতে দেরী দেখে আমি সমস্ত কাজ করে ঘুমিয়ে পড়েছি। সবিস্তারে সমস্ত ঘটনা খুলে বলার পর তিনি কিছুটা স্বাভাবিক হলেন। তারপর তিনটি তাবিজ আমাদের হাতে দিয়ে অত্যান্ত প্রফুল্ল হাঁসি হেসে বললেন–হাল্কা তাবিজই দিলাম। পরে দরকার হলে গরম তাবিজ দেব। হাল্কা তাবিজে কাজ হলে গরম তাবিজের দরকার হয় কি? তাবিজ তিনটি আমি নিয়ে বললাম – তাবিজগুলো কিভাবে ব্যাবহার করতে হবে? – একটি ছেলে পরবে, একটি মেয়ে যে পথে হাঁটে সেই পথের মাঝে পুঁতে রাখতে হবে যাতে এক সপ্তাহের মধ্যে মেয়েটি তাবিজটি ডিঙিয়ে যায়। তাবিজ

ডিঙাইলেই মনের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি হবে। আর সর্বশেষটি কোন ফলবান গাছের ডালের সাথে বাঁধতে হবে। বাতাসে গাছের ডালে যখন দোলা লাগবে তখন মেয়েটির মনে ও দোলা লাগবে আর ছেলেটিকে দেখার জন্য মনটা ছট্‌ফট্‌ করতে থাকবে। তবে হ্যাঁ এই কয়দিন ছেলেটিকে অবশ্যই মেয়েটির সামনে সামনে থাকতে হবে যাতে করে মেয়েটির চোখে ছেলেটির ছায়া পড়ে। – কাজ হবে তো! – হবে না মানে? না হলে তো আমি আছি। সর্বাত্মক চেষ্টা আমি করে যাব।

সমস্ত কিছু শুনে ও বুঝে মনে নতুন আশা নিয়ে পুনরায় অনেক কষ্টে যখন ফিরে এলাম তখন রাত্রি বেশ হয়ে গেছে। এমনি ক্ষণে ঘরে ফিরলে নানাবিধ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে ভেবে তিনজন একত্রে শহীদের ঘরেই রাত কাটানোর চিন্তা করলাম। সকালে যা হয় হোক। শুয়ে পড়লাম ঠিকই কিন্তু ঘুম এলোনা। প্রথম এবং তৃতীয় তাবিজের ব্যাবহার খুব সহজেই করা যাবে কিন্তু দ্বিতীয়টি বেশ কঠিন। আবার এও বিপত্তি যে কাজটি শহীদকে নিজে করতে হবে। কিভাবে করা যায় সে চিন্তা তিনজনে বেশ খানিক্ষণ ধরে করলাম। শেষে সিদ্ধান্ত হল শুক্রবারে যখন সবাই Arabian nights দেখতে যাবে তখনোই সুযোগ মত কাজটি করতে হবে। এ ছাড়া আর কোন সুযোগ নেই। কিন্তু শুক্রবার আসতে দু'দিন বাকী। এ দু'টি দিন শহীদের কাছে দু'টি বৎসরের মত। দু'দিনই হোক আর দু'বছরই হোক অগত্যা শহীদকে তাই মানতে হল। সমস্ত সিদ্ধান্ত এবং পরিকল্পনা করে সকালে আমরা যার যার ঘরে ফিরে এলাম।

শুক্রবার এলো এবং আমরা তিনজন ও কার্যসিদ্ধির জন্য বের হলাম। সংগে করে বাঁশের কঞ্চি সুচালো করে নিলাম যাতে খুব সহজেই মাটির মধ্যে কঞ্চি প্রবেশ করিয়ে গর্ত করে তাবিজটি ঢুকিয়ে মুখ বন্ধ করে দেয়া যায়। এখানে একটা কথা বলে রাখা আবশ্যক যে সমস্ত গ্রামের মধ্যে শুধুমাত্র সরকার বাড়ীতেই একটি টেলিভিশন সেট যা ব্যাটারী দিয়ে চালানো হতো। গ্রামের সমস্ত মানুষ অন্যকোন অনুষ্টান না দেখলেও Arabian nights দেখার কথা কেউ ভুলত না বলে শুক্রবার সরকার বাড়ী বিশাল এক অনুষ্টানের মতই জনগণের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠত। আজও তার ব্যাতিক্রম হলো না। লোক আসা যেন শেষ হতে চায় না। এক পর্যায়ে Arabian nights শুরু হল। সমস্ত জনগণ যখন তন্ময় হয়ে দেখছে সেই সুযোগে বারান্দায় যেখানে মাটির ঢিবি ছিল তার পশে শহিদ সবার অলক্ষ্যে অত্যান্ত কৌশলে কাজটি সেরে ফেলল। অনুষ্টান শেষে দর্শকদের সাথে সাথে আমরাও ফিরে এলাম। পরদিন হতে শুরু হল শহীদের নতুন চাকরী অবশ্য সহকর্মী হিসেবে আমর ও আর তা হল তানিয়ার সামনে সামনে থাকা। বন্যার কারণে রাস্তাঘাট ডুবে যাবার কারণে যাতায়তের বাহন হিসেবে নদীতে নামলো শ্যালো নৌকা। স্কুল সময়ে বেশ কয়েকটি নৌকা যাতায়াত করে যার একটি ছিল আমাদের প্রতিবেশী নূর মোহাম্মদ ভাই এর। সুবিধা হল এই যে এই নৌকাটিতে চড়েই তানিয়া এবং বেশ কিছু ছাত্র–ছাত্রী স্কুলে আসা–যাওয়া করত। তাই সবার আগে আমরা দু'জন নৌকায় উঠে একেবারে পেছনে গিয়ে বসতাম এজন্য যে সামনে বসত পুরুষ মানুষের দল আর পেছনে স্কুল গামী ছাত্রীদের দল। অত্যাদিক পরিচিত তাছাড়া প্রতিবেশী সেই সূত্র ধরে নূর মোহাম্মদ ভাই এর কাছে নৌকার হাল ধরার আবদার করতেই তিনি হাল ধরতে অনুমতি দিতেন। আমি

হাল ধরা মাত্র সবার সাথে একপলক মিষ্টি হাঁসি বিনিময় হতো। দৈবাৎ কোন ক্ষণে যদি শহীদের সাথে তানিয়ার দৃষ্টি বিনিময় হত তখন শহীদ খুশীতে আত্মহারা হয়ে পড়ত এই ভেবে যে হয়তো কাজ হচ্ছে। কিন্তু পরক্ষণেই তানিয়া যখন দৃষ্টি সরিয়ে আমার দিকে চেয়ে লাজুক হাঁসি হাঁসত তখন শহীদের মনে বিষাদ এসে উপস্থিত হত। ভাবত তার তানিয়া বুঝি বা আমাকে ভালোবেসে ফেলেছে আর ওস্তাদের কলকাঠি বিপরীত দিকে নড়ছে।

এমনি করে আরও কিছু দিন অতিবাহিত হল। শেষকালে শহীদের আশংকাই সত্যি হল। একদিন পাড়ার একটি মেয়ের শুনতে পেলাম তানিয়ার দু'নয়নে শহীদের নয় আমার উল্টো প্রতিবিম্ব ভাসছে। হাই স্কুল পাশ করে কলেজে প্রবেশ অবধি চেহারার গুণেই হোক বা কর্মের গুণেই হোক কোন মেয়ের মনের মাঝে প্রবেশ করতে পারিনি। এই প্রথম কেউ আমাকে চাইল তাও আবার আমার বন্ধুর কল্পনার বাগ্‌দত্তা তাই সাহস হলো না স্বীকৃতি দেবার। ভাবলাম এই সুযোগে একান্ত গোপনে তানিয়ার সাথে স্বাক্ষাত করে শহীদের মনের কথা ব্যাক্ত করব ভেবে মেয়েটির মাধ্যমে খবর পাঠালাম যে আমি তানিয়ার সাথে দেখা করব।

পাড়াগাঁয়ে কোন সাবালিকা মেয়ের সাথে স্বাক্ষাত করার মোক্ষম সময় হচ্ছে রাত্রিকাল। শহরের মত পাড়াগাঁয়ে রঙ–বেরঙের নিয়ন আলোর পথঘাট আলোকিত হয়ে থাকেনা। ঘন কালো অন্ধকার এমনভাবে ঘনায়িত হয়ে থাকে যে দশ হাত দুরে কি আছে তা দেখার মত দৃষ্টিশক্তি সৃষ্টিকর্তা দেন নি। তাছাড়া দিনের বেলায় কথা বলতে গেলে যদি কেউ দেখে ফেলে তবে আর নিস্তার নেই। বেহায়া–বেয়াদব অপবাদ তো পড়বেই তার উপর অন্য শাস্তি যে পড়বেনা এমনটাও নয়। তাই রাত্রিকালেই তানিয়ার সাথে স্বাক্ষাত করার ক্ষণ নির্ধারণ করলাম। তানিয়াও এতে সম্মত হল। নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে আবারও সেই আমবাগানে উপস্থিত হলাম। কথা ছিল কোকিলের স্বর নকল করে ডাকলেই তানিয়া বুঝতে পারবে যে আমি এসেছি। কিন্তু বিপত্তি হল বসন্ত আসতে এখনও ঢের দেরী। অসময়ে কোকিলের ডাক শুনলে কোন বেরসিক যদি লাঠি নিয়ে আমার কোকিল সাজা বের করে দেয় তখন? তাই ভাবলাম পেঁচার ডাক ডাকা যাক। কিন্তু পেঁচার ডাক ও তো অকল্যানের যা শুনলে সবাই দুর দুর করে তাড়িয়ে দেয়। থাক্ আর ডাকা-ডাকিতে কাজ নেই। দু'দিনের পরিশ্রম বৃথা যায় যাক্ (পাখির স্বর নকল করে ডাকার কৌশল আয়ত্বে আনার)। ডোবার পাশ দিয়ে জানালা দিয়ে উঁকি দিলেই তানিয়া দেখতে পাবে। জানালার পাশে গিয়ে ভাবলাম ঘরে যদি অন্য কেউ থাকে? শেষকালে জানালার দু'পাটিতে যে ফাঁক ছিল তার সাথে দুচোখ লাগিয়ে দীর্ঘক্ষণ করে বুঝতে পালাম যে ঘরটিতে আর প্রত্যাশার ব্যাক্তিনী ছাড়া আর কেউ নেই। সাহস করে চাপাস্বরে ডাক দিলাম– তানিয়া!

আমার কণ্ঠস্বর শুনে তানিয়া প্রথমটায় থতমত খেয়ে গেল। তারপর বিকশিত দন্ত দু'পাটি বের করে এমন মুক্তার মত একঝলক হাঁসি উপহার দিল যে আমার মাথা ঘুরে যাবার উপক্রম হল। এই হাঁসি যদি শহীদকে উদ্দেশ্য করে দিত তবে আমি নিশ্চিত যে শহীদসমস্ত কিছু ত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করত না। আমি কিন্তু অতটা খুশী হতে পারলাম না। বন্ধুর কথা বলতে পারব

এই আনন্দটী আমার কাছে মধুর বলে মনে হল। তানিয়া ঘর থেকে অত্যান্ত সাবধানে বের হয়ে এল। দু'জনে একত্রে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ করলাম। দেখলাম আমাকে নিয়ে তানিয়া গভীর স্বপ্নে বিভোর। আমি বন্ধুর সাথে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না। মনে সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে বন্ধুর কথা খুলে বললাম। শহীদের কথা শুনা মাত্র তানিয়া খড়ের আগুনের ন্যায় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। শেষকালে আগুন যখন কিছুটা নিস্প্রভ হল তখন আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল– অপরের দালালী করতে লজ্জা লাগেনা? আমি তো আপনাকে ভালই জানতাম, কিন্তু আপনি যে একটা দালাল তাতো জানতাম না! গট গট করে কথাগুলো বলে তানিয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করল। আমি হতবিহ্বলের ন্যায় ক্ষণকাল ওর গন্তব্যের পানে চেয়ে রইলাম। ভাবলাম হয়তো আবারও ফিরে আসবে কিন্তু আর এল না। শেষ অবধি তানিয়া যখন এলই না তখন ধীরে ধীরে নিজের ঘরের দিকে যাত্রা করলাম। আমার আর তানিয়ার সমস্ত কথাগুলো গোপন রাখলাম। শহীদ যদি জানতে পারে তবে প্রচন্ড কষ্ট পাবে। শহীদকে বারংবার আশ্বস্ত করতে লাগলাম যে তানিয়া তারই হবে। তাবিজের পর তাবিজ চলতে লাগল কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তানিয়াকে প্রস্তাবও দিয়েছি তাতেও কাজ হল না। শহীদকে ও ফেরাতে পারলাম না। শেষে সিদ্ধান্ত নিলাম শেষবারের মত ওস্তাদের কাছে যাব এবং জেনে আসব কাজ হবে কি না। ওস্তাদ শেষকালে যে গরম তাবিজের কথা বলেছিলন সেটা দেবার জন্য বলব। গেলাম এবং বললাম ও। শেষকালে ওস্তাদ সেটাই দেবার মনস্থির করলেন এবং আরও কয়েকদিন সময় প্রার্থনা করলেন। অবশ্য তিনি শেষ চেষ্টায় করেছিলেন কিন্তু সে শেষ চেষ্টা দেখার সৌভাগ্য হয়ে উঠেনি। আমরা যখন তাবিজ করার চেষ্টায় ব্যাস্ত সে সময় প্রজাপতীর দু'ডানা একত্রিত করার চেষ্টা যে চলছিল তা আমাদের সকলেরই অজানা ছিল। শেষকালে প্রজাপতীর দু'ডানা একত্রিত হল অর্থাৎ তানিয়া বধু সেজে আমার আর শহীদের নাকের ডগার উপর দিয়ে অন্য একজনের হাত ধরে বাসর করতে চলে গেল।

ব্যাপারটা আমি স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিতে পারলে ও শহীদ পারল না। ঘরে ধানের ক্ষেতে দেবার কীটনাশক ছিল। সবার অলক্ষ্যে রাত্রিকালে শহীদ তা পান করে প্রেমের জন্য শহীদ হয়ে গেল। সকালে খবর পেয়ে যখন ওকে দেখতে গেলাম তখন দেখলাম গলায় ঝুলছে হতাশার আশা নামক সেই ভন্ড তাবিজ। তাড়াতাড়ি গলা থেকে খুলে দূরে ছুঁড়ে মারলাম তারপর শহীদকে তার চির আপন ঘরে শুইয়ে দিয়ে ফিরে এলাম। এখনও পেপার–পত্রিকায় সংকট মোচন শিরোনামে বিভিন্ন ভন্ডামীর চিহ্ন দেখে আঁৎকে উঠি আর মনে পড়ে যায় শহীদের হাস্যেজ্বল সেই মুখচ্ছবি। মনের মাঝ থেকে অস্ফুট স্বরে বের হয় "ক্ষমা করে দিস্ বন্ধু, তোর এই অধম বন্ধুকে"।

খন্দকার মোঃ আবদুল গণি, গ্রাম: নিতাই নগর, নগর, বড়ইগ্রাম, নাটোর